চলচ্চিত্রের রূপ-অরূপ

boobook

চলচ্চিত্রের রূপ-অরূপ

মাহমুদুল হোসেন

boobook

নোনেতা

প্রকাশক

নোকতা

কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা–১২০৫

✆ +৮৮০ ১৮৪৭ ২২৭৭৭৭

dak@noktaarts.com, noktaarts.com

প্রথম নোকতা সংস্করণ আশ্বিন ১৪২৩, অক্টোবর ২০১৬

গ্রন্থস্বত্ব

টেক্সট © মাহমুদুল হোসেন
বই © নোকতা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সোমনাথ ঘোষ

পরিবেশক

বাতিঘর/পাঠক সমাবেশ

পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশক

মনফকিরা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

জ্যাক প্রিন্টার্স, ভারত

ISBN 978-984-90-7524-0

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোন অংশেরই কোনরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

Chalachitrer Roop-Aroop, a collection of articles on film by mahmudul hossain published by nokta, october 2016, dhaka, bangladesh

পাঠকের মূল্য: ৳ ৩৫০ । ₹ ৩৫০

boobook

উৎসর্গ

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রসংসদ আন্দোলন ও বিকল্প চলচ্চিত্রের আন্দোলন

boobook

বিষয়সূচি

০৯ প্রাককথন

১৩ ভূমিকা

boobook

প্রযুক্তি ও তত্ত্ব

১৯ চলচ্চিত্রের ভাষা: জনজীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব ও চলচ্চিত্রে জনজীবন

৩৯ প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার ও চলচ্চিত্রের মুক্তি

দেশ-ভাবনা

৫১ বাংলাদেশের চলচ্চিত্র: উৎকর্ষের খোঁজে

৭৩ বাংলাদেশের অন্য চলচ্চিত্র: প্রান্তিকের নন্দনতত্ত্ব

নির্মাণ ও নির্মাতা

৯৭ চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ
১১৯ রায় পুনর্বিবেচনা: একটি লিখন মাত্র
১২৭ শঙ্খনাদ: নিজস্ব নয়নপুর অথবা চিত্রনাট্যের বিষয় আসয়
১৪৭ মেঘমল্লার: অন্তর্জাত বিনির্মাণের দৃশ্যাবলি
১৬৩ অনিল বাগচীর একদিন: মোনোক্রোম সময়ে বর্ণিল বেদনার গাথা
১৭১ রূপালী পর্দার রাজ্যে পারুল আর কিরণমালা

সংগঠন-ভাবনা

১৮৯ চলচ্চিত্রসংসদ-আন্দোলনের ভবিষ্যৎ-কৌশল প্রসঙ্গে
২০৭ ভিজুয়াল মতানৈক্যের পঁচিশ বছর
২২৭ আমাদের দৃশ্য-সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্রসংসদ আন্দোলন
২৪১ যৌথ-সিনেমাবিষয়ক কিছু সম্পূরক ভাবনা

boighook

প্রাককথন

১.

খুব পরিকল্পনা করে লেখা হয়ে ওঠে না আমার। মূলত তাগাদা পেলেই লিখি–সাময়িকীর সম্পাদকীয় দপ্তরের তাগাদা অথবা সেমিনারের তাগাদা। অনেকে একে বলেন ফরমায়েশি লেখা এবং এভাবে লেখা উৎপন্ন হওয়াটাকে আবার অনেকে ভালো চোখে দেখেন না। কিন্তু আমার লেখা এভাবেই চলেছে, যতদিন ধরে লিখছি ততদিন ধরে। তবে, ফরমায়েশটা নিচ্ছি যখন, তখন বিষয়টা আমাকে টানছে কি না, সেটা ভেবে দেখছি নিশ্চয়ই। না টানলে লিখি না, লিখতে পারি না। এটা বলতে পারি নির্দ্বিধায় যে, লেখার ফরমায়েশ পেয়ে আমার বরং লাভই হয়। এমন অনেক বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করতে হয় অথবা এমন ছবি প্রথমবারের মতো দেখতে বসি যা ওই তাগিদটা না থাকলে হতো না। আমার মতো খণ্ডকালীন লেখকের জন্যে ব্যাপারটা ভালো। এ বছরই দেখতে পাচ্ছি, এমন অন্তত দুটি লেখা লিখেছি যেগুলি আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে কখনও লিখতাম না।

আগের চেয়ে ইদানিং লেখার জন্যে অনুরুদ্ধ হচ্ছি বেশি। সেটার অনেকরকম কারণ থাকতে পারে। তবে আমার মনে হয়, আমাদের দেশে চলচ্চিত্রবিষয়ক কর্মকাণ্ড বাড়ছে–এটাই সবচেয়ে বড়ো কারণ। বিশেষ করে চলচ্চিত্রের ওপর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিস্তারটা অনেক বেড়েছে, সেটা আমার

ধারণায়, সেমিনার, জার্নাল এসব অ্যাকাডেমিক ব্যাপারগুলির প্রয়োজন বাড়িয়ে দিচ্ছে; আর পরোক্ষে, চলচ্চিত্র নিয়ে তাত্ত্বিক চর্চায় আরো অনেককেই আকর্ষণ করছে। চলচ্চিত্র নিয়ে আধা-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষণ, অ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স, কর্মশালা হচ্ছে অনেক; যারা শিল্প-সাময়িকী প্রকাশ করছেন তারা আগের চেয়ে চলচ্চিত্রে আগ্রহ দেখাচ্ছেন বেশি। সব মিলিয়ে চলচ্চিত্র-চিন্তার চাহিদা বেড়ে গেছে। এই বর্ধিত চাহিদারই প্রকাশ হচ্ছে সম্ভাব্য চলচ্চিত্র-লেখকদের কাছে বেশি বেশি লেখার অনুরোধ। তাহলে লেখক কি বাড়ছে না একই অনুপাতে? হয়তো বাড়ছে, তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা ব্লগে এক-দেড়শ শব্দের লেখক যত বেড়েছে, আরো একটু বড়ো লেখার লেখক তত বাড়ে নি এখনও। এটা আশা করি সময়ের ব্যাপার। চাহিদা–চলচ্চিত্র-চিন্তার, যদি অব্যাহত থাকে তবে তার সরবরাহও বাড়বে। এ ক্ষেত্রে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রাথমিক সূত্রের ওপরই ভরসা রাখছি!

মান একটি ব্যাপার। নিজের লেখা নিয়েই এটি আমার মনে হয়েছে প্রথমে। লেখার সংখ্যা তার মানকে প্রভাবিত করছে কি? দ্রুত লেখা শেষ করতে হওয়ার চাপ অথবা একই সময়ে কাছাকাছি বিষয়ে একাধিক লেখা– এসব, চিন্তার অস্বচ্ছতা অথবা পুনরাবৃত্তির মতো দুষ্টতায় আক্রান্ত করছে কি লেখাকে? সচেতন হবার চেষ্টা করেছি। নতুন কিছু না বলবার থাকলে বলা থেকে বিরত থেকেছি অথবা দ্বিরুক্তি করলে তার কারণ ব্যাখ্যা করেছি। আর সাধারণভাবে আমার মনে হয়েছে, অনেক কিছুর মতো বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নিয়েও এখন একটা কালাত্রিক্রমণ চলছে। এক ধরনের পরিপক্কতা এবং স্থিতাবস্থা অর্জিত হলে চলচ্চিত্র-চিন্তায়ও কাঙ্ক্ষিত মান অর্জিত হবে; অথবা, চলচ্চিত্র-চিন্তার ধারাবাহিকতাই সামগ্রিক চলচ্চিত্রচর্চাকে পরিপক্কতা দেবে। তার আগে পর্যন্ত আমাদের যার যার কাজ করে যেতে হবে।

২.

সব লেখা অবশ্য ফরমায়েশি নয়; নির্দিষ্ট কোথাও প্রকাশ করার কথা ভেবেও লেখা নয়; ভেতরের তাগিদে লেখা। সত্যজিৎ রায় যেদিন মারা গিয়েছিলেন, আজ থেকে প্রায় ২৩-২৪ বছর আগে, সেই সন্ধ্যা এবং রাতটি নানাভাবে বিশিষ্ট হয়ে আছে আমার জীবনে। সেই থেকে *রায় পুনর্বিবেচনা: একটি লিখন মাত্র* এই শিরোনামের লেখাটি আমার ভেতরে ছিলই। এতদিনে তা লিখে ফেলা গেল। এর একটি পরিমার্জিত রূপ অবশ্য ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছিল প্রায়

লেখাতেই করার প্রয়োজন বোধ করি নি। দুয়েকটি তথ্যের ভুল ঠিক করা, কিছু টীকা-ভাষ্যে পূর্ণতা আনার চেষ্টা আর কিছু দ্বিরুক্তি বাতিল করা– এভাবেই সামান্য সম্পাদনা সম্পন্ন হয়েছে।

এই বইতে চারটি অধ্যায় ভাগ আছে এবং সব মিলে চৌদ্দটি লেখা আছে। কিন্তু একটি ভাবনা যেন আছে পুরো বইটি জুড়েই। সেটি হচ্ছে এই সময়ে, একবিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয় দশকে চলমান ছবির আধিপত্য নিয়ে। কেবল প্রচলিত চলচ্চিত্রের কথা বলছি না; প্রচারে, যোগাযোগে, অভিব্যক্তিতে চলমান ছবি যে প্রাধান্য অর্জন করেছে সেদিকে মনোযোগী হতে চেয়েছি। প্রযুক্তির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে; একে প্যারাডাইম শিফট বললে বিজ্ঞানের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আপত্তি করছেন। কিন্তু প্রযুক্তির এই পরিবর্তন মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবন-ভাবনায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনেছে। এক্ষেত্রে চলমান ছবির ভূমিকাটি বেশ বড়ো। এই বইয়ের বিভিন্ন লেখায় এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে এবং চলচ্চিত্রের এই ব্যাপকভিত্তিক রূপটিকে নিয়ে চর্চার গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

৪.

boobook

চলচ্চিত্রবিষয়ক আমার প্রথম বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০১০ সালে। সেখানে স্থান পেয়েছিল প্রায় তিন দশক ধরে রচিত আমার কিছু লেখা। সে তুলনায় এবার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে করা কাজের ভেতর থেকে বেছে নিয়েই এই প্রকাশ! চলচ্চিত্র-চিন্তার চাহিদার যে বৃদ্ধির কথা লিখেছি এই কথনের শুরুতে, তার সূত্র ধরে বলি, লেখাগুলিকে একত্রিত করে এক মলাটের মধ্যে প্রকাশ করার একটি তাগিদ নিজেই অনুভব করেছি। চলচ্চিত্র নিয়ে আগ্রহী জনদের সাথে কাজ করতে যেয়ে মনে হয়েছে সম্ভবত এর প্রয়োজন আছে।

চলচ্চিত্রনির্মাতা মোরশেদুল ইসলাম এই গ্রন্থের ভূমিকাটি লিখেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নোকতা দৃশ্য¨-সংস্কৃতি নিয়ে পরিপাটি কাজ করছে। এই গ্রন্থটি তার অন্যথা হবে না, এই আশা করছি।

মাহমুদুল হোসেন

ঢাকা, নবেম্বর ২০১৫

ভূমিকা

boobook

মাহমুদুল হোসেনের লেখা আমাকে বরাবরই চমৎকৃত করে। আমি ওর লেখার একজন মনোযোগী পাঠক। ওর লেখার মধ্যে যেমন থাকে বিষয়ের গভীরে যেয়ে তা নিজের মত করে বিশ্লেষণের চেষ্টা, তেমনি ওর লেখার ধরণটাও খুব আকর্ষণীয়। ওর লেখার মধ্যে একজন পাঠক খুব সহজেই মগ্ন হয়ে যেতে পারে। খুব সিরিয়াস একটি বিষয়কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেও সহজ সরলভাবে উপস্থাপন করার ফলেই লেখকের সাথে খুব সহজেই একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায় পাঠকের।

মাহমুদুল হোসেনের *'চলচ্চিত্রের রূপ-অরূপ'* শীর্ষক গ্রন্থের প্রতিটি লেখাতেই তাঁর এই সহজ সরল লেখন শৈলীর বিষয়টা স্পষ্ট। গ্রন্থটিতে মোট ১৪টি লেখা আছে। লেখাগুলোকে আবার বিষয়বস্তু অনুসারে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন *'প্রযুক্তি ও তত্ত্ব' 'দেশ ভাবনা', 'নির্মাণ ও নির্মাতা'* এবং *'সংগঠন ভাবনা'*। এই ভাগের ফলে পাঠকের পক্ষে সহজেই বেছে নেয়া সম্ভব হবে তাঁর পছন্দের বিষয়ের লেখাটি।

বইটিতে মোট ১৪টি প্রবন্ধ রয়েছে, যার সবগুলোই ২০১১ থেকে ২০১৫ সময়কালের মধ্যে লেখা। চলচ্চিত্রের ভাষা সম্পর্কিত প্রথম প্রবন্ধটি সাধারণ পাঠকের কাছে কিছুটা কঠিন মনে হতে পারে। তবে চলচ্চিত্রে আগ্রহী

পাঠকদের কাছে লেখাটি যথেষ্ট আগ্রহোদ্দীপক মনে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রবন্ধটিতে মাহমুদুল হোসেন বিশ্বসেরা চলচ্চিত্র তাত্ত্বিকদের উদ্ধৃতি ও তত্ত্বের উল্লেখ করেই দায় সারেন নি, নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে চলচ্চিত্র-ভাষার সম্ভাবনার দিকটি পাঠকের কাছে প্রাঞ্জল করে তোলার প্রয়াস নিয়েছেন। পাশাপাশি জনজীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব ও গুরুত্বের দিকটিও সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুখপাঠ্য। সম্ভবত আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবের সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ হওয়ার কারনেই লেখাটি তিনি সহজ করে লিখেছেন। তবে সহজ হলেও বিষয়বস্তুর গভীরে যেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিজস্ব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরার ক্ষেত্রে লেখাটি মোটেও সাধারণ নয়। চলচ্চিত্র একটি প্রযুক্তিগত শিল্পমাধ্যম। প্রযক্তির সাথে সাথে চলচ্চিত্রের ক্রমান্বয়ে শিল্প হয়ে ওঠা থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তির সঠিক ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে আগামী দিনের চলচ্চিত্রের সম্ভাবনার কথা সুন্দরভাবে উঠে এসেছে লেখাটিতে।

বইয়ের তৃতীয় লেখাটি, যার শিরোনাম *'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র: উৎকর্ষের সন্ধানে'* সাম্প্রতিক সময়ে লেখা। এই লেখাটি এবং তার পরের লেখাটি *'বাংলাদেশের অন্য চলচ্চিত্র: প্রান্তিকের নন্দনতত্ত্ব'* বিষয়বস্তুগতভাবে অনেকটা কাছাকাছি, ঠাঁইও হয়েছে তাই *'দেশভাবনা'* শীর্ষক যুগলবন্দীতে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চলচ্চিত্র এবং বাংলাদেশের অন্য চলচ্চিত্র নিয়ে এমন চমৎকার বিশ্লেষণধর্মী লেখা আমার আর চোখে পড়ে নি।

নির্মাণ ও নির্মাতা বিভাগে ৬টি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। এর মধ্যে *চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রনাথ* এবং সত্যজিৎ রায়-এর ওপর লেখা দুটি প্রবন্ধ যথেষ্ট চিন্তা উদ্দীপক। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখাটি একই সাথে তথ্যবহুল এবং বিশ্লেষণাত্বক। সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে লেখাটি সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে অনেকটাই এই মহান চলচ্চিত্রকারের মহাপ্রয়াণে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির নির্যাস।

৩টি চলচ্চিত্র নিয়ে পরের ৩টি লেখা। *'শঙ্খনাদ'* ছাড়া বাকী দুটি লেখা *'মেঘমল্লার'* এবং *'অনিল বাগচীর একদিন'* সাম্প্রতিক ছবি নিয়ে। পরের দুটি লেখাকে 'চলচ্চিত্র সমালোচনা'র গোত্রভুক্ত করা গেলেও ঠিক প্রথাগত চলচ্চিত্র সমালোচনা নয়, অনেকটাই বিশ্লেষণ ও ব্যক্তিগত অনুভূতির সংমিশ্রণ। *'শঙ্খনাদ'* নিয়ে লেখাটি একেবারেই অন্যরকম। একটি চলচ্চিত্র দেখার পরপর তা লেখকের মনোজগতে কীভাবে একটি অভিঘাত তৈরি করেছিল এবং কয়েক

বছর পর তা আবার দেখার পর কিছুটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে তার বিশ্লেষণের চেষ্টা। লেখাটিতে নতুনত্ব এবং বৈচিত্র্য আছে নি:সন্দেহে।

বইয়ের পরের প্রবন্ধটি লোককাহিনীভিত্তিক চলচ্চিত্র নিয়ে। আমাদের সিরিয়াস লেখকরা সাধারণত: এ ধরনের বিষয় নিয়ে লেখেন না। সেদিক থেকে মাহমুদুল হোসেনকে ধন্যবাদ দিতে হয় এ ধরনের একটি লেখা বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য।

বইয়ের পরের বিভাগটি হচ্ছে সংগঠন ভাবনা। এই বিভাগে মোট ৪টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুটি প্রবন্ধ চলচ্চিত্রসংসদ আন্দোলন নিয়ে, একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলন নিয়ে, অপরটি যৌথ সিনেমা নিয়ে। চলচ্চিত্রসংসদ আন্দোলন নিয়ে লেখা দুটি এই আন্দোলনটিকে মূল্যায়ন করার পাশাপাশি আমাদের কিছু দিক নির্দেশনাও দেয়। মাহমুদুল হোসেন দীর্ঘদিন ধরে চলচ্চিত্রসংসদ আন্দোলনের সাথে যুক্ত। এই আন্দোলনটি নিয়ে তার নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও প্রগাঢ় উপলব্ধি তাই সহজাত ভালবাসা থেকেই সঞ্চারিত। এদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনকেও তিনি অনেক কাছ থেকে দেখেছেন। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে লেখা তার প্রবন্ধ *'ভিজুয়াল মতানৈক্যের পঁচিশ বছর'*ও তাই হয়ে উঠেছে একজন কাছের মানুষের বিশ্লেষণ।

boubook

বইয়ের শেষ প্রবন্ধটি যৌথ সিনেমা নিয়ে। যৌথ সিনেমা বলতে এখানে লেখক Collective Cinema'র কথা বলেছেন, Joint Venture এর কথা নয়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আজকের বাস্তবতায়; কিন্তু যথেষ্ট জটিলও বটে। এই জটিল বিষয়টি সম্পর্কে লেখক তার কিছু মূল্যবান মতামত ও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন, যা বিষয়টি সম্পর্কে ভাবতে বিকল্প সিনেমার যাত্রীদের, বিশেষ করে নতুন নির্মাতাদের উৎসাহী করে তুলবে।

সবশেষে বলা যায়, মাহমুদুল হোসেনের *'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র: উৎকর্ষের সন্ধানে ও অন্যান্য প্রবন্ধ'* বইটি বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে ও লেখনির উৎকর্ষে সমৃদ্ধ একটি সুখপাঠ্য বই। চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বইয়ের এই আকালের যুগে এই বইটি নি:সন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

মোরশেদুল ইসলাম
২১ ডিসেম্বর, ২০১৫

যাযুক্তি ও তত্ত্ব

boobook

চলচ্চিত্রের ভাষা:
জনজীবনে চলচ্চিত্রের প্রভাব ও
চলচ্চিত্রে জনজীবন

boobook

১. চলচ্চিত্রের ভাষা

"There are voices in every film, regardless of how idealist and corny the sentiment reads; under the voices of the actors, characters and CGI dreamscapes, a consistent film identity is rambling off about its thousand moving parts. The audience "hears" this voice, and decides if it is one they agree with, find annoying, or respect."[১]

সম্ভবত বাহুল্যই; তবু লিখে নেওয়া যাক যে, এ রচনায় আমাদের আগ্রহের বিষয় দুটি। প্রথমত, চলচ্চিত্রের ভাষা এবং দ্বিতীয়ত, জনজীবন এবং চলচ্চিত্রের দ্বিমুখী সম্পর্ক। আপাত এক সম্পর্ক এই দুই অধ্যায়ের মধ্যে যেন রচিত হয়েই আছে; যে, একটি প্রকাশমাধ্যম হিসেবে ভাষার ভেতর দিয়েই চলচ্চিত্রের উপস্থিতি এবং তার গ্রাহ্যতা। আর সাধারণভাবে চলচ্চিত্রের গ্রাহ্যতা অবশ্যই অনেক মানুষের মধ্যে—যেন জনজীবনেই। তাহলে এই গ্রাহ্যতা অর্জিত হয় যে ভাষার ভেতর দিয়ে—চলচ্চিত্রের ভাষা, আশা করা যেতেই পারে যে, জনজীবনের সাথে তার একটি নিবিড় সম্পর্ক থাকবে; অন্তত, অনেক মানুষের কাছে এই ভাষার একটা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। এরকম

লেখার সময় আমরা যেন সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, চলচ্চিত্রের একটি সাধারণ ভাষা আছে; সারা পৃথিবীর তাবৎ চলচ্চিত্র একই ভাষায় কথা বলে—অন্তত এরকম একটি ভাষা যা বিশ্বের সকল চলচ্চিত্র-দর্শক একটি পর্যায় পর্যন্ত পাঠ বা উপলব্ধি করতে পারে। এ সিদ্ধান্তটি কিন্তু গ্রহণ করার অপেক্ষায় থাকে।

চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আরো এক ধরনের দ্বিধার ভেতর পড়তে হয় যেন। আসলে ঠিক কী নিয়ে আলোচনা করতে চাই আমরা? চলচ্চিত্র একটি প্রকাশমাধ্যম হিসেবে কী কৌশলে কাজ করে তা-ই আমাদের আলোচ্য না কি চলচ্চিত্র কীভাবে কাজ করে দর্শকের মধ্যে তা আমাদের আগ্রহের বিষয়—এই নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু মনে হতে পারে, আমরা কী আসলে একই প্রসঙ্গের দুই প্রান্ত ধরে কথা বলছি না! যে কৌশলে বিবৃত হয় চলচ্চিত্র তা কি দর্শকের পাঠের জন্যেই জরুরি নয়? এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ দেখি না। কিন্তু লক্ষ না করে পারি না যে, চলচ্চিত্রের প্রকাশের যে কৌশলগুলি তারা এক ধরনের স্থিতাবস্থা অর্জন করেছে চলচ্চিত্রের আবির্ভাবের চার দশকের ভেতরই। কিন্তু চলচ্চিত্র কীভাবে কাজ করে দর্শকের মধ্যে—এই আলোচনা ক্রমাগত জটিল হয়ে উঠেছে এবং মানুষের জ্ঞানকাণ্ড যতই বিস্তৃত হয়েছে এই আলোচনা ততই নানা চিন্তাকে ধারণ করে এগিয়ে গেছে। দেখছি কাজ—অর্থাৎ, চলচ্চিত্র নির্মাণ; চিন্তা—অর্থাৎ, চলচ্চিত্র–ভাষাতত্ত্ব বেশ আলাদা দুটি যাত্রা হয়ে উঠেছে। এই দুই যাত্রার মধ্যে ফারাকটি সমান্তরাল এবং অনিরাময়—এরকম সিনিক্যাল মত প্রকাশ করছি না, কিন্তু চলচ্চিত্রের ভাষা নিয়ে কথা বলতে গেলে এই ফারাকটির মুখোমুখি হতে হয় এবং কিছু দুরূহ ভাবনার পথ পাড়ি না দিয়ে প্রসঙ্গটির প্রতি সুবিচার করা যায় না।

"Film *grammar* was and is a necessity for exhibiting crucial information to the audience, but film *language* is the voice that arises from the grammar.... The communicative methods of film are not the product of grammatical rules (although they work out of that as a base) but plug directly into our own perceptual experience of reality."[২]

গত শতকের পাঁচের দশকে আন্দ্রে বাজাঁ চলচ্চিত্র-ভাষার বিকাশের যে তাত্ত্বিক ইতিহাস রচনা করেছিলেন তা প্রকাশমাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রকে বিবেচনা করার প্রথম সর্বব্যাপি উদ্যোগ এবং সেই বিবেচনায় চলচ্চিত্র-ভাষার ধ্রুপদী তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। বিশেষ করে বাজাঁ এমন সময়

প্রভাবিত করবে কি না, সেটা নির্ভর করবে ব্যবহৃত কার্যসাধন পদ্ধতির আরো নানা বৈশিষ্ট্যের ওপর।

যদিও এ বিভাজনে বিস্তর আপত্তি উঠবে তবু একথা লেখার বিকল্প নেই যে, চলচ্চিত্র অন্তত ভাষার দিকে থেকে সাধারণ ও বিশেষ; অন্য কথায় জনপ্রিয় এবং অন্য—এই দুই ধারার বিভক্ত। এই দুই ধারা সমান্তরাল নয়; অন্য চলচ্চিত্র তার বিশেষ ভাষায় পৌঁছনোর আগে অবধারিতভাবেই সাধারণ ভাষাকে আত্মস্থ করে। কিন্তু অন্য চলচ্চিত্র দর্শকপ্রিয়তার দিক থেকে প্রান্তিক এবং ভাষার আলোচনাতেও প্রান্তিক। তবে জনজীবনকে "প্রভাবিত" করার প্রসঙ্গটিকে সবচেয়ে প্রধান না করে তুলে চলচ্চিত্রকে সামাজিক ডিসকোর্সের একটি ফাংশনাল উপাদান হিসেবে চিন্তা করলে ভিন্ন কোনো দৃষ্টিকোণ পাওয়া যেতে পারে। চলচ্চিত্রের ভাষা এবং জনজীবনবিষয়ক এই ভাবনা আরো মূর্ত এবং বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে যদি সেসব চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করা যায় যারা কোনো সামাজিক ডিসকোর্সের জন্ম দিতে পেরেছে অথবা কীভাবে কোনো সামাজিক ডিসকোর্স একটি চলচ্চিত্রের জন্ম দিতে পারে এরকম আলোচনায় রত হওয়া যায়। এরকম একটি প্রচেষ্টা পরবর্তী কোনো লেখার জন্যে তোলা থাকতে পারে।

boobook

[ফেব্রুয়ারি ২০১২। শিল্প ও শিল্পী, প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, সম্পাদক: আবুল হাসনাত, প্রকাশক: আবুল খায়ের- এ প্রকাশিত।]